দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 22 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খয়রাতি সাহায্য থেকে সরকারী অনুদান

এবিএম মূসা

আমার শৈশবের অন্যতম মধুর স্মৃতি হচ্ছে নানার বাড়ির দহলিজে সকাল বেলা মৌলভী সাহেবের কাছে আরবী পড়া ; লেখাপড়ায় হাতে খড়ি অ-আ-ক-খ দিয়ে নয়, শুরু হয়েছিল আলেফ-বে দিয়ে। রামসুন্দর বসাকের বাল্য শিক্ষার আগে হাতে উঠেছিল মুখদুমী লাইব্রেরীর "কায়দা"। একদিকে যেমন শিশু শ্রেণী থেকে উপরে উঠতে লাগলাম, তেমনি কায়দা থেকে আমপারা, তারপরে কোরান-পাক। এরপরও আরবী পড়েছি, স্কুলে এমনকি কলেজ পর্যায়ে। দু'টি কারণে আরবী পড়া হয়েছিল। প্রথমত একটি ক্লাসিক যথা আরবী, ফার্সী, উর্দু বা সংস্কৃত ও পালি, পড়াটা ম্যাট্রিকে বর্তমান এসএসসিতে বাধ্যতামূলক ছিল। দ্বিতীয়ত এই একটি বিষয়ে প্রচুর নম্বর পাওয়া যেত, বুঝে-না বুঝে মুখস্থ করলেই চলত। ম্যাট্রিকে আর কোন বিষয়ে লেটার না পেলেও আরবীতে অবশ্যম্ভাবী ছিল। তৃতীয়ত ভাষাটা আমার কাছে কেন জানি মধুর মনে হতো। সেই যে ছোট বেলায় সুর করে দুইয়ের নামতার পাশাপাশি সুর করে আলেফ জবর-আ, বে জবর-বা পড়েছিলাম তার রেশ সারা জীবন রয়ে গিয়েছিল।

আরবী পড়ার প্রসঙ্গটি মনে পড়ছে সাম্প্রতিককালে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তিকর আলোচনার প্রেক্ষিতে। আমাদের সামাজিক জীবনে ধর্মের একটি প্রভাব রয়েছে সেই অনাদিকাল থেকে। সেই ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় শিক্ষার পটভূমিতেই মাদ্রাসার কথা চিন্তা করা হয়। ব্রিটিশ আমলেই মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক পর্যন্ত সবাই মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও সংস্কার এনেছেন। কিন্তু গ্রাম-বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষা একই খাতে রয়ে গেছে। মূলত মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রসারের চেয়েও ধর্মের সঙ্গে বা ধর্মীয় সংস্কৃতি অব্যাহত রাখার ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। গাঁয়ে-গঞ্জে সাধারণভাবে মাদ্রাসায় পড়ানো বলা হতো না, বলত "ছেলেকে আরবী পড়াব।" কারও হয়ত বড় দুই ছেলে স্কুলে যায়, ছোট ছেলেটির বেলায় বাপ বলতেন, "এই ছেলেটাকে দ্বীনি এলেম দেব।"

প্রধানত এই ধারণা থেকেই মক্তব-মাদ্রাসাগুলো স্থাপিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে। মাদ্রাসা স্থাপনের ক্ষেত্রেও দুটি চিন্তাধারা ছিল। এখন কি বলে জানি না, তখন বলা হতো "ওল্ড স্কীম" আর "নিউ স্কীম।" পুরনো ধারায় মাদ্রাসায় শুধু আরবী, ফার্সী, হাদিস, মাসায়েল এসবই শেখানো হতো। নিউ স্কীমে ইংরেজী বাংলা যোগ করা হলো। শুনেছি দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসিন "নিউ স্কীমের" অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখনকার দিনে প্রায় প্রতি জেলায় "ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ" স্থাপিত হয়েছিল এই ধারারই অনুসরণে। শহরে যাই হোক গ্রামের মাদ্রাসাগুলি, বিশেষ করে পুরনো ধাঁচের "ওল্ড স্কীম" চলত সম্পূর্ণ দানের ওপর নির্ভর করে। সাধারণের ভাষায় বলা হতো, খয়রাতি সাহায্য। ইংরেজী শিক্ষিতেরা অন্যায়ভাবে অবজ্ঞা করে বলতেন মোল্লা বানানোর কারখানা। তবুও শিক্ষিতদের অনেকেরই এসব মাদ্রাসার প্রতি দুর্বলতা ছিল। তাঁরা কোন-না-কোনভাবে এগুলর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ-সাহায্য করতেন। এছাড়া গ্রামের মানুষের সাহায্য করার পন্থা ছিল বছর-ওয়ারী ধান মাদ্রাসাকে দান করা। আমার মনে পড়ছে, কৃষকের ঘরে ধান উঠলে সবাই ধোপা-নাপিতকে বছর-ওয়ারী ধান দিতেন। অপরদিকে মাদ্রাসার হুজুর আর তালেব এলেমরা ধান সংগ্রহ করতে বেরুতেন। এই দিয়েই চলত মক্তব-মাদ্রাসার সারা বছরের ব্যয়-নির্বাহ। এইসব খয়রাতি সাহায্য কোন মাদ্রাসা কত আদায় করতে পেরেছে, কীভাবে খরচ হত তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। কারণ সেই খয়রাতের পরিমাণ এখনকার সরকারী অনুদানের মতো অঢেল ছিল না।

শুধু বছরকার ধান দিয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলত জানি না। তবে মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্রদের সবাই জায়গীর রাখতেন, যাকে বলা হতো আহার-বাসস্থান ফ্রী। এঁরা সম্পন্ন গৃহস্থের কাচারী ঘরে থাকতেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী আজান দিতেন, নামাজ পড়াতেন। স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষককে জায়গীর রাখাটা সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজটি তাঁরা করতেন আশপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সকাল-বেলা আরবী পড়ানো ও নামাজ শেখানো। এছাড়া আরেকটি উপরি আয়ের উৎস ছিল হুজুরদের তা হচ্ছে নানা উপলক্ষে কোন বাড়িতে মিলাদ পড়ানো। এজন্য সামান্য নজরানা পেতেন। কোন কোন মাদ্রাসা ওয়াকফ সম্পত্তির আয়েও চলত, তবে সেক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ কদাচিৎ পাওয়া যেত। সরকারী পর্যায়ে এসব মাদ্রাসায় কোন সাহায্য আসত কিনা, শিক্ষকদের বেতনের ব্যয়ভার সরকার আদৌ বইতেন কিনা এ সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা ছিল না। সরকারী অনুদান নিয়ে যে রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এখন মাদ্রাসগুলির অবস্থা আগের মতো অসচ্ছল নয়। টাকা-পয়সার বিষয়টি বেসরকারী স্কুল-কলেজের মতো মাদ্রাসায়ও অনুপ্রবেশ করেছে। এতদিন শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি হতো এখন দ্বীনি এলেমের পীঠস্থানগুলো নিয়েও রাজনীতি হচ্ছে। লেনদেনের ব্যাপার থাকলেই ব্যবসায়ী স্বার্থের সংঘাত হবে। আমাদের দেশে সংঘাতবিহীন রাজনীতি যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি রাজনীতি-নির্ভর সংঘাতও স্বাভাবিক আর যদি এর সঙ্গে মালপানির ব্যাপার জড়িত থাকে তবেত কথাই নেই।

মাদ্রাসা এখন শুধু হুজুরদের আওতায় নেই, এখন শুনি মাদ্রাসা "চালানো" হয়। যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগের মতো সামান্য ধান-চালের "খয়রাত" চাইবেন তা আশা করা বাতুলতা। বিশেষ করে সরকারী খাতে যখন অঢেল পয়সা পাওয়া যাচ্ছে তখন ক্ষুণ্নিবৃত্তি করার দরকার কি? এই পয়সা আসার সাথে সাথে ধাপ্পাবাজির পথও প্রশস্ত হচ্ছে। মাদ্রাসার জন্য প্রদত্ত সাহায্যের অপব্যবহার হচ্ছে অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার নামে, ভুয়া শিক্ষকদের নাম ও হিসাব দেখিয়ে। ধর্মীয় শিক্ষার দোহাই দিয়ে অধর্মের ব্যবসা বন্ধ করতে গিয়ে এখন সরকার বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী বিপাকে পড়েছেন। ধর্ম শিক্ষায় নীতিহীনতা কতটুকু ধর্মসম্মত এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কায়েমী স্বার্থে আঘাত আসার কারণেই "গেল, গেল" রব উঠেছে। মজার ব্যাপার হল, বিরোধী দলও সুযোগ বুঝে ধর্মীয় শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবসাকে পরোক্ষ সমর্থন জানাচ্ছে। একটি অনৈতিক কাজকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে সমর্থন দিচ্ছে, এই কারণেই চিরাচরিত ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়েছেন। অথচ বিষয়টি বা অপকর্মটি তাঁদের আমলেই প্রথমবার সরকারের নজরে এসেছিল। তাঁরা অনুসন্ধান করে ভুয়া মাদ্রাসার যে লিস্টি তৈরি করেছিল বর্তমান সরকার শুধু তার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আসলে যে প্রতিষ্ঠানটি নেই তা বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠে কী করে অভিযোগ হচ্ছে কিসের কিসের ভিত্তিতে?

এই সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে দিচ্ছে বলে যে অপপ্রচার করছে বিশেষ মহল, তা শুধু নিজেদের অপকর্ম চাপা দেয়ার জন্য নয়। ধর্মকে রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর যে অপচেষ্টা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে মাদ্রাসা ইস্যুকে সামনে এনে। যেখানে ধর্মীয় কাজের দোহাই দিয়ে হারামভাবে অর্থোপার্জনের বিরুদ্ধে ফতোয়া আশা করা উচিত, সেখানে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে টাকা নেয়ার কাজটি বন্ধ করাতে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে সত্যকে গোপন করে। মাদ্রাসা বন্ধ করা হচ্ছে বলা হয়, কিন্তু কেন ও কোন ধরনের অপকর্ম বন্ধে সরকার হাত বাড়িয়েছে তা উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা খোলসা করে বলেনা।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা ইস্যুটির সাথে আরও একটি জিকির তোলা হয়েছে যা ধর্মের আড়ালে আরেকটি রাজনৈতিক ইস্যু বলে মনে হতে পারে। হঠাৎ করে ডাস্টবিনে পবিত্র কোরান-পাক পাওয়া যাচ্ছে কেন সে আরেক রহস্য। যদি কেউ এই অপকর্মটি করে থাকে তাতে সরকার কিভাবে জড়িত হতে পারেন তাও বোধগম্য নয়। বরং এই অপকর্মটি করে কেউ সরকারকে বিব্রত করছে কিনা সেটাই ভেবে দেখতে হবে। নেহায়েৎ উন্মাদের কাজ বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না কেউ অপকর্মটি করাচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে হবে। পবিত্র কোরান মজিদের অবমাননায় সবারই ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ রয়েছে, ধর্মীয় চেতনার ব্যাপারে যাঁরা সংবেদনশীল তারা ক্ষোভ প্রকাশের জন্য অবশ্যই মাঠে নামবেন। কিন্তু কিছুদিন আগে মাদ্রাসা পরীক্ষার সময়ে নকলবাজ মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরের বিশেষ অঙ্গে, এমনকি জুতার ভিতর, টয়লেটে যে কোরান হাদিসের পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে বলে খবর বেরিয়েছিল তখনো পবিত্র কোরান-হাদিস অবমাননাকারী মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তির দাবিতে সবার সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল। তখন কি প্রতিবাদ, শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় নিন্দাসূচক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল? হয়ত প্রতিবাদের ঝড় বয়েছিল, কিন্তু আমার নজরে পড়েনি। যদি প্রতিবাদ না হয়ে থাকে কেন হয়নি সেই ব্যাখ্যা দেবেন কি আজকে যাঁরা সব "গেল-গেল" বলে রাস্তায় নেমেছেন, জনসভায় উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন?

আসলে ধর্ম শিক্ষার দোহাই দিয়ে যাঁরা এতদিন মাদ্রাসার ব্যবসা করেছিলেন, এমনকি ধর্ম শিক্ষকদের আপন স্বার্থে ব্যবহার করেছেন কায়েমী স্বার্থে ঘা লেগেছে বলেই তাঁরা অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন সরকার শুধু ভুয়া মাদ্রাসা নয়, অস্তিত্বহীন স্কুল-কলেজের ব্যাপারেও যথার্থ পদক্ষেপ নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষা-ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে দিশের মানুষকে মূর্খ বানিয়ে রাখতে চায় এমন কথা কেউ বলবেন না। সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই চাইবেন, ধর্মীয় শিক্ষায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকুক। খয়রাতি সাহায্যের ওপর ভরসা করে এখন আর কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। তা শোভন নয়, তা কারো কাম্যও নয়। সেই দিন নেই, সেই যুগও নেই যে মাদ্রাসার মোদাররেসিন আর তালেবানরা আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও ট্র্যাডিশনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাড়ি-বাড়ি, গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াবেন। তাই বলে জনগণের টাকায় দেয়া অনুদান কোন খয়রাতি সাহায্য নয় যে হিসাব নেয়া যাবে না, শুধু চাইলেই পাওয়া যাবে।